তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের হালচাল
পৃষ্ঠা: ৪

এনার্জি বাংলা

ঢাকা, মঙ্গলবার
৭ই মাঘ ১৪২৬, ২১শে জানুয়ারি ২০২০
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মূল্য ২০ টাকা
নিবন্ধন নং : ১২৯

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ‘উনিশ-বিশ’

রাজধানীর হাতিরঝিলে উচ্চক্ষমতার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো সম্ভাবনাকে জানান দিচ্ছে। ছবি : এনার্জি বাংলা

অরুণ কর্মকার

উনিশ আর বিশের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। মাত্র এক ধাপ। তাই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে ‘উনিশ-বিশ’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়। এই প্রতিবেদনের শিরোনামের উনিশ-বিশও অনেকটা সেই অর্থেই ব্যবহৃত। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ২০১৯-এর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির সঙ্গে ২০২০-এর সম্ভাব্য পরিস্থিতির তুল্যমূল্য বিচার।

অর্থাৎ ২০১৯ সালে যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি দেখেছি, ২০২০ সালে তা কেমন হবে? একইভাবে ২০১৯ সালে প্রত্যক্ষ করা জ্বালানি পরিস্থিতিই বা ২০২০ সালে কেমন দেখা যাবে? উনিশ-বিশ বলতে যে সামান্য ব্যবধান বুঝায়, এই দুই বছরের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতিও কি তেমনই দেখা যাবে, নাকি অন্যরকম কিছু হতে পারে? তবে এই আলোচনায় ২০১৯-এর চিত্র যেমন আমাদের দেখা বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হবে, ২০২০-এর বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই তা হবে না। সেটি হবে যুক্তিভিত্তিক অনুমেয়।

একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯০১ সালে ঢাকার নবাববাড়ি আহসান মঞ্জিলে আলো জ্বালানোর মধ্য দিয়ে এ দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা হয়েছিল। সেই বিদ্যুতের উৎস ছিল একটি ডিজেল জেনারেটর। তার ৭০ বছর, ১৯৭১ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন এখানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল সাকুল্যে ৫৫০ মেগাওয়াট। এরও ৩৮ বছর পর ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াট। আর এর ১০ বছর পর, ২০১৯ সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর স্থাপিত ক্ষমতা ২২ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট।

অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে হারে অগ্রগতি হয়েছে, সঞ্চালন ও বিতরণ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগোতে পারেনি। এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনায় কিছু দুর্বলতা ছিল। ফলে সব গ্রাহক সব সময় প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ পায়নি। উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শিল্প-কারখানার মত বিশেষ শ্রেণির গ্রাহকদেরও প্রায় প্রতিদিনই লোডশেডিংয়ের চাপ নিতে হয়েছে।

২০১৯ সালে বিদ্যুৎ খাতের আর যে একটি দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে তা হল-চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হওয়া।

এরপর ২ পৃষ্ঠায়

ভারতে এলপিজি রপ্তানি শুরু
সুযোগ চায় আরও কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ থেকে ভারতে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) রপ্তানি শুরু হয়েছে। দুটো কোম্পানি রপ্তানি করছে। আরও অনেক কোম্পানি রপ্তানির সুযোগ চায়। জ্বালানি বিভাগে এজন্য একাধিক কোম্পানি আবেদন করেছে। এসব আবেদন পর্যালোচনায় রয়েছে।

বেসরকারি খাতের কোম্পানি ওমেরা পেট্রোলিয়াম এবং বেক্সিমকো এলপিজি এই রপ্তানি শুরু করেছে। সড়ক পথে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য ত্রিপুরায় এলপিজি যাচ্ছে।

যদিও রপ্তানি করা এলপিজি বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করে আবার রপ্তানি করা হচ্ছে, তবুও দেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় আরো একটি নাম যোগ হলো। এতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। বেসরকারি রপ্তানিকারকদের জন্য এটি নতুন একটি আয়ের দিগন্ত উন্মোচন করলো।

সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে প্রতিমাসে প্রায় এক হাজার টন এলপিজি রপ্তানি হচ্ছে। তবে কয়েক মাসের মধ্যে এই পরিমান আড়াই হাজার টনে পৌঁছবে। পরে তা আরও বাড়বে।

বাংলাদেশের মত ভারতও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলপি গ্যাস আমদানি করে। তবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সেই গাস পাঠানো অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। তাই ভারত ওই অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশ থেকে এলপি গ্যাস নিচ্ছে।

বেক্সিমকো এবং ওমেরা এলপিজির কাঁচামাল আমদানি করে। এর মধ্যে একটি অংশ তাদের কারখানায় নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে সিলিন্ডারে ভরে দেশের মধ্যে সরবরাহ করে। আর অন্য অংশটি সড়ক পথে ত্রিপুরায় পাঠায়। ত্রিপুরায় ভারতের কারখানায় ওই গাস সিলিন্ডারজাত করা হয়।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুক্তির আওতায় প্রথম বছর ৫ থেকে ১৫ হাজার টন এলপি গ্যাস রপ্তানি করার পরিকল্পনা আছে। ত্রিপুরায় এখন যে ফিলিং সেন্টার রয়েছে তার সক্ষমতাও সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টন। ভারত তাদের ফিলিং সেন্টারের সক্ষমতা বাড়ালে রপ্তানির পরিমাণও বাড়বে।

রপ্তানি করা এলপি গ্যাস কুমিল্লা জেলার বিবিরবাজার স্থল সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরার বিশালগড়ে পাঠানো হচ্ছে। বিশালগড়ে বোতলজাত করার কারখানায় গ্যাস বোতলজাত করে ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন তা সেখানে বাজারজাত করছে।

এলপিজি রপ্তানির সুযোগ বাংলাদেশি এলপিজি কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন বাজারের সূচনা করেছে। এর ফলে দেশের রপ্তানি আয় বাড়বে।

বাংলাদেশে এলপিজির ব্যবহার গত চার বছরে প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। বর্তমানে দেশে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ ২৫ হাজার টন এলপিজি ব্যবহার হচ্ছে যা ২০১৫ সালে ছিল আড়াই লাখ টন। দেশে ২০টিরও বেশি কোম্পানি এখন এলপি গ্যাসের ব্যবসায়ে যুক্ত।

বেক্সিমকো ও ওমেরা ছাড়া আরও কিছু কোম্পানি এলপিজি রপ্তানির জন্য আবেদন করেছে। শুরুতে ওই দুই কোম্পানিকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ ১৪২৬, ২১শে জানুয়ারি ২০২০

সম্পাদকীয়

আসছে মূল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দিন

সামনে আসছে মূল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দিন। গত বছর গরম আর সেচ মৌসুম কেটেছে ভালোই। লোডশেডিংয়ের কথা এখন মানুষ ভুলেই গেছে। বিদ্যুৎ থাকবে না একথা এখন যেন কল্পনার অতীত। তবে এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য অর্থনৈতিক যে চাপ, তা নিয়ে এখন চিন্তা। সেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে পারাই এখন কাজ।

পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র এটি। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়েকটা নতুন ও উল্লেখ করার মতো বিষয় আছে। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র এখানে এক ইউনিটে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এর আগে এক ইউনিটে ৪৫০ মেগাওয়াট ছিল সবচেয়ে বড়। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র কয়লা দিয়ে চলবে। আর সেই কয়লা হবে আমদানি করা। এর খরচ যে তুলনায় কম হওয়ার কথা ছিল, ততটা হবে জানা যাচ্ছে না।

আপাতত ৬৬০ মেগাওয়াট হলেও কিছুদিনের মধ্যেই এর উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াটে পৌঁছবে। তখন কয়লা আমাদনির পরিমাণও বাড়াতে হবে।

সাশ্রয়ের জন্য বড় স্থায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপেক্ষা দীর্ঘদিনের। সেই দীর্ঘদিনের অবসান কাটিয়ে সুন্দর সময়ের দিন কিছুটা বাকি। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে উৎপাদন খরচ কিছুটা কমবে। কিন্তু যদি আগের মতোই অলস কেন্দ্র পুষিয়ে রাখা হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ না নিয়েও ক্যাপাসিটির নামে অর্থ যোগান দিয়ে যেতে হয়, তবে সাশ্রয় হওয়ার সুফল দেখা যাবে না।

একদিকে উৎপাদন খরচ কমছে কিন্তু অন্যদিকে বাড়তি খরচ থেকেই যাচ্ছে। তাই দ্রুত এই খরচ কমাতে হবে অর্থাৎ উচ্চমূল্যের, বেশি জ্বালানি লাগে, দক্ষতা কম এমন সব বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে হবে। যত দ্রুত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে, তত দ্রুতই পুরো সুফল পাওয়া যাবে।

এখন তেলচালিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হয় ১৩ টাকা ৬২ পয়সা। এটা ফার্নেস অয়েলের দাম। তবে ডিজেল-এ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২৭ টাকাও খরচ হয়। আর পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি ইউনিটের দাম ছয় টাকা বা তারও চেয়ে কম হবে বলে জানানো হচ্ছে।

এখন অন্য কোন দিকে ঘাটতি না ফেলে এই আমদানির ডলার যোগান দেয়াও নতুন চিন্তা।

সাথে আরো একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। পায়রা চালু হওয়ার সাথে সাথে অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়লো। এখন বেশি দামের তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করার অন্যতম সময়। কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হবে কিনা বা কিভাবে হবে, সেটি বড় চ্যালেঞ্জ। তেলভিত্তিক উচ্চ দামের বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করার কোন লক্ষণ এই মুহূর্তে নেই। কারণ যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু আছে সবারই চুক্তি আছে। সম্প্রতি সময় চুক্তি বাতিল হয়ে যাচ্ছে এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই। বরং দু'একটার চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে। ফলে ওইসব বিদুৎকেন্দ্র চালু রাখতে হবে অথবা চালু না রাখলে তার জন্য খরচ চালিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে যেতে হবে। এতে কম দামের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুফল পেতে দেরি হবে।

বোরো মৌসুম শুরু হচ্ছে। তার পরেই গরম। বিদ্যুতের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। বরাবরের মতো এবারও তেল দিয়ে বিদ্যুৎ পুরোটা চালানো এবং সার কারখানা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

এলপিজি রপ্তানি শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হলো আরো একটি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির 'উনিশ-বিশ'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফলে উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অলস বসে ছিল। কিন্তু সেগুলোর জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিপুল অংকের অর্থ সরকারকে দিতে হয়েছে (ক্যাপাসিটি চার্জ)। সরকারি খাতের বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসে থাকলেও পরোক্ষ লোকসান আছে। এই সব ক্যাপাসিটি চার্জ ও পরোক্ষ লোকসান বিদ্যুৎ খাতের ব্যয় বাড়াচ্ছে।

এই বিপুল উৎপাদন ক্ষমতার বিদ্যুৎ অলস পড়ে থাকা এটা বাস্তবতা ও সর্বজনে দৃশ্যমান। বিষয়টি সর্বজনে দৃশ্যমান হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়, তা হলো– আমাদের দেশে (হয়তো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও) বিদ্যুতের চাহিদার যে ধরন (লোড প্যাটার্ন) তাতে এর অন্যথা হওয়া খুব কঠিন।

যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে শীতকালের তিন-চার মাস বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ৮ হাজার মেগাওয়াটের মধ্যে। আবার গ্রীষ্মকাল এলেই চাহিদা হবে ১৫-১৬ হাজার মেগাওয়াট। এই অবস্থায় শীতকালের জন্য আট হাজার এবং গ্রীষ্মকালের জন্য তার দ্বিগুণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতা প্রতিষ্ঠা করে রাখা অসম্ভব। পৃথিবীর সব দেশেই মৌসুম, সকাল-সন্ধ্যা, ছুটির দিন ও কাজের দিনভেদে বিদ্যুতের চাহিদা বেশ খানিকটা বাড়ে-কমে। সে জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চাহিদার সময় (পিক আওয়ার-অফপিক আওয়ার) সর্বত্রই নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু কোথাও সেই সময় অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের আলাদা ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় না। ফলে অলস থাকেই। তবে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত হলে এর পরিমাণ কম রাখা যায়। তাতে ব্যয়ভার কিংবা লোকসান কমে।

বিশ'র বিদ্যুৎ : ২০২০ সালে বিদ্যুৎ খাতের সবচেয়ে বড় অর্জন হবে সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন। এটিকে শুধু বিশ সালের অর্জন বলা যদিও ঠিক হচ্ছে না। কেননা, এই অর্জন ২০১০ সালে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তার ফল। কিন্তু ঘটনাটি যেহেতু ঘটবে এই বছর সেহেতু একে বিশ সালে অর্জিত সাফল্য বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া, ২০২০ সালে কয়লাভিত্তিক বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু শুরু হওয়ার বছর হিসেবেও বিশেষত্ব পাবে। যেগুলোর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, এই বছর তার অবসান হচ্ছে। ইতিমধ্যে পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই বছরই ওই কেন্দ্রটির দ্বিতীয় ইউনিটও উৎপাদনে আসবে।

কয়লাভিত্তিক বড় কেন্দ্র ছাড়া আরও কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। তার মধ্যেও বিশ সালে চালু হওয়ার মত কেন্দ্রও আছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, গত ১০ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, ২০২০ সালেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি, কিছুটা পেছনে পড়ে যাওয়া সঞ্চালন ও বিতরণ খাতেও এই বছর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।

বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ : বিদ্যুৎ খাতে উন্নতি যতই হোক না কেন, কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েগেছে। এরমধ্যে প্রথমত নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এর পূর্বশর্ত সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ সাশ্রয়ী দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ।

বিদ্যুতের দামে বৈষম্য নিরসন আরেকটি চ্যালেঞ্জ। যারা গ্রিডের বাইরে রয়েছেন এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তাদের ব্যবহৃত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বেশি। যেমন, যারা সৌর ব্যবহার করছেন তাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ে প্রায় ৭২ টাকা। আর যারা মিনি গ্রিড থেকে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ে ৩০ টাকা। অথচ গ্রিডের বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিটের গড় দাম সাড়ে ৬ টাকার মতো।

বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকদের দায়িত্বশীল করতে জনসচেতনতা সৃষ্টি বড় কাজ।

উনিশ'র জ্বালানি : উনিশের বিদ্যুৎ, আসলে বলা ভাল ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে সাফল্য যেমন প্রশংসিত হয়েছে, জ্বালানি খাত নিয়ে হয়েছে ঠিক বিপরীত আলোচনা। কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, বিদ্যুতের যদি অগ্রগতি হয়ে থাকে তাহলে জ্বালানিরও নিশ্চয়ই হয়েছে। কেননা, জ্বালানি ছাড়া তো বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। একেবারে মোম যুক্তি।

কিন্তু কথা হচ্ছে, গত ১০ বছরে বিদ্যুৎ খাত যেমন দেশনির্ভর হয়েছে, দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে, জ্বালানি খাত রয়েছে তার বিপরীত ধারায়। জ্বালানি খাত গত ১০ বছরে আরও বেশি পরনির্ভর, অর্থাৎ বিদেশনির্ভর বা আমদানিনির্ভর হয়েছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাড়তি চাহিদার জ্বালানি সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু তা আমদানি করা। জ্বালানি তেল, এলএনজি এবং সর্বশেষ কয়লা আমদানি শুরু হয়েছে।

২০১৯ সালে দেশের নিজস্ব গ্যাস উত্তোলন এক বিন্দুও বাড়েনি। দেশের কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। কাজেই ২০১৯ সালের জ্বালানি খাতের সাফল্য দেশের জন্য কিছুটা চিন্তা বাড়িয়েছে। তাই উনিশের জ্বালানিখাতকে স্থবির মনে করতে বাধ্য। ২০১৯ সালে এই খাতের ব্যবস্থাপনাও যে আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে তেমনও নয়।

জ্বালানির বিশ : তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২০ সালেও জ্বালানি খাত আগের বছরের ঘোরাটোপেই ঘুরপাক খাবে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ-এ বছর সব ধরনের জ্বালানির আমদানি বাড়বে। এলএনজি, এলপি গ্যাস ও কয়লার আমদানি তো বাড়বেই, জ্বালানি তেলের আমদানিও বাড়তে পারে। না বাড়লেও অন্তত কমবে না।

অন্যদিকে দেশের ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা নেই। উৎপাদন না বাড়ার কারণ নতুন কোনো অনুসন্ধান ও আবিষ্কার নেই। কমার কারণ, দেশের প্রায় সব গ্যাসক্ষেত্রে চাপ কমে যাচ্ছে।

ওদিকে গভীর কিংবা অগভীর সমুদ্রবক্ষে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কোনো অগ্রগতি নেই। সেখান থেকেও এ বছরের মধ্যে কোনো সুখবর আসার সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে কিছুটা আশাবাদী হওয়ার ছিল ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসির কাজ নিয়ে। মহেশখালীর কাঞ্চন নামক স্থানে তাদের একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করার কথা বছরখানেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ খবর অনুযায়ী তাদের সে কূপ খনন এ বছর নাও হতে পারে।

আমরা সবাই জানি, এ বছরের ১৭ই মার্চ থেকে আগামী বছরের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত দেশে মুজিববর্ষ পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে অসংখ্য সমস্যা মোকাবেলা করার মধ্যেও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে স্থলভাগের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র কিনেছিলেন। তিনি সমুদ্রবক্ষে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশি কোম্পানি নিয়োগ দিয়ে ছিলেন। এখন আমাদের প্রশ্ন-এই মুজিববর্ষে জ্বালানি খাতের এহেন দুরাবস্থা উত্তোরণ হবে তো?

আমাদের দেশ কি প্রকৃতই গ্যাসশূন্য হয়ে পড়েছে? জবাব হচ্ছে– মোটেই না। ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তো বটেই, স্থলভাগেও অনেক গ্যাসের মজুদ রয়েছে।

গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে জানতে ১৯৮৬ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ৬টি সমীক্ষা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে এবং আরও কয়েকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে এসব সমীক্ষা করেছিল।

সমীক্ষাগুলোতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গভীর সমুদ্র বাদ দিয়ে গ্যাসের ন্যূনতম মজুদ ৩২ টিসিএফ। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশে গ্যাসের আবিষ্কৃত মজুদ ২০ টিসিএফেরও কম।

এসব সমীক্ষার পর এখন পর্যন্ত খুব সামান্যই অনুসন্ধান হয়েছে। দেশে যে অনেক গ্যাস আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু দরকার অনুসন্ধান জোরদার করা। মুজিববর্ষে তেমনই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশা।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী-
'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে আমাদের লক্ষ্য :

১. ''মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ'' হিসেবে পালন; ২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা;
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের 'উঠান বৈঠক' জোরদার করা;
৫. 'আমার গ্রাম – আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;
৬. ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'' নীতি জোরদার করা;
৭. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে 'পেপারলেস অফিস' চালু করা;
৮. 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা;
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

মার্চে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ সময় অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। ছবি : এনার্জি বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওঅ্যান্ডএম) জন্য আগামী মার্চ মাসে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি হচ্ছে। মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ সমন্বয় কমিটির (জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি) সভার সময় এই চুক্তি সই হতে পারে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওঅ্যান্ডএম চুক্তি করা হবে।

চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে রাশিয়ার বিশেষায়িত পেশাজীবীদের ওপর। এই বিশেষায়িত পেশাজীবীদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত পেশাজীবীরা কাজ করবেন। পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কাজটি বাংলাদেশের পেশাজীবীরাই পরিচালনা করবেন।

রাশিয়ার কারগরি ও আর্থিক সহায়তায় পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুরে নির্মীয়মান দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে থ্রি+ প্রজন্মের দুটি ভিভিইআর-১২০০ রিয়্যাক্টর স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই দুটি ইউনিটের প্রথমটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে চালু হওয়ার কথা।

সূত্র জানায়, রূপপুর প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই এগিয়ে চলেছে। রূপপুরে প্রথম ইউনিটের রিয়্যাক্টর স্থাপনের কাঠামো প্রস্তুত করার কাজ যেমন সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি রাশিয়ার প্রথম ইউনিটের রিয়্যাক্টর তৈরির কাজও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলেছে।

রাশিয়ার এইএম টেকনোলজি এটোমাশের ভলগাদন্স্ক শাখায় রূপপুর প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের রিয়্যাক্টর, স্টিম জেনারেটর সেট এবং টারবাইন আইল্যান্ডের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ইউনিটের রিয়্যাক্টরের ওপর সেমি-ভেসেল সংযোজনের কাজও শেষ হয়েছে।

রূপপুর প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের কাজও বসে নেই। প্রথম ইউনিটের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইউনিটের জন্যও রাশিয়া থেকে বাবলার ট্যাংক শিপমেন্টের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সরবরাহ শুরু করেছে রুশ প্রতিষ্ঠান জিও-পাদলস্ক।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি করপোরেশনের মেশিনারি প্রস্থতকারী বিভাগ-এটমএনার্গোমাশের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান এই জিও-পাদলস্ক।

যে কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বাবলার ট্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ, যা রিয়্যাক্টর প্ল্যান্ট প্রেসারাইজার সিস্টেমের অংশ। ১৫ টন ওজনের এই বাবলার ট্যাংকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ মিটার, উচ্চতা ৪ মিটার, ব্যাস ২ দশমিক ৫ মিটার। এটির আয়ুষ্কাল ৪০ বছর।

রূপপুর প্রকল্পের জন্য নির্মিত বাবলার ট্যাংকের কারিগরি নকশা করেছে রুশ প্রতিষ্ঠান গিদ্রোপ্রেস। আর এর বিস্তারিত নকশা তথ্য প্রস্তুত করেছে জিও-পাদলস্কের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প যন্ত্রপাতি বিভাগ। এই বিভাগটি বাবলার ট্যাংক স্থাপনের কাজে তত্ত্বাবধান সেবাও দিয়ে থাকে।

২০১৯ জুড়ে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা

ইবি ডেস্ক

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা ছিল ২০১৯ জুড়ে। ঘূর্ণিঝড় বন্যা ভূমিকম্প দাবানল আগ্নেয়গিরি। কোনোটাই বাদ যায়নি। সব দুর্যোগেই প্রাণহানি হয়েছে। হয়েছে সম্পদের ক্ষতি। এগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মোজাম্বিকে ঘূর্ণিঝড় ইদাইয়ে প্রাণ হারান ১ হাজার ৭৩ জন। বাহামাসে ঘূর্ণিঝড় ডোরিয়ানের তাণ্ডবে ৫২ জনের মৃত্যু হয়। এতে নিখোঁজ ছিল এক হাজার ৩শ' জন। ফিলিপাইনে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্যায় ৩২ জনের মৃত্যু হয়।

অতিবৃষ্টিতে বন্যায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে কমপক্ষে ২২৭ জনের মৃত্যু হয়। বছরের শেষে এসে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবে বাংলাদেশ ও ভারতে ১৪ জন মারা যান। এ বছর ইটালির ভেনিসে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখেছে বিশ্ব।

২০১৯ সালজুড়েই বিশ্বব্যাপী রেকর্ড পরিমাণ উষ্ণ তাপমাত্রা ছিল। পৃথিবীর ফুসফুসখ্যাত অ্যামাজনে আগুনে এক হাজার ৭০০ মাইল বনাঞ্চল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়াবহ দাবানলে অনেক এলাকা পুড়ে গেছে। নিউজিল্যান্ডে মৃত ঘোষণা করার কয়েকদিন পরেই আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। এতে ১৮ জন নিহত হয়। আলবেনিয়ায় ৬ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অর্ধশত মানুষ মারা যান।

পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত অ্যামাজন বন পুড়ছে

জ্বালানি তেলের উত্তোলন বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি : সংগৃহীত

শীর্ষ জ্বালানি তেল উত্তোলনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের শীর্ষ জ্বালানি তেল উত্তোলনকারী দেশ। গেল সপ্তাহে জ্বালানি তেল উত্তোলনে আবার রেকর্ড করেছে তারা। দৈনিক গড়ে এক কোটি ৩০ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেল উত্তোলন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইউএস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইআইএ) সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে।

চলতি ও আগামী বছর এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ইআইএ।

চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক গড়ে এক কোটি ৩৩ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেল উত্তোলন করবে বলে জানিয়েছে। পরের বছর আরও বাড়িয়ে এক কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার টন হবে।

জ্বালানি তেল আমদানি বাড়িয়েছে চীন

আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জ্বালানি তেল আমদানি বাড়িয়েছে চীন। ১৭ বছর ধরে চীন টানা প্রতিবছর জ্বালানি তেল আমদানি বাড়াচ্ছেছ।

বিদায়ী বছরেও দেশটিতে জ্বালানি পণ্যটির আমদানি ৫০ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। চাহিদা বাড়ায় আমদানিও বাড়তির দিকে।

চীনা রাজস্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশে ২০১৯ সালে ৫০ কোটি ৬০ লাখ টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়। দৈনিক হিসাবে এর পরিমাণ প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ১ লাখ ২ হাজার ব্যারেল।

তেল উৎপাদন কমাবে রাশিয়া

ওপেকের শর্ত পূরণে তেল উৎপাদন কমাবে রাশিয়া। চলতি মাসে ওপেক প্লাস জোটের চুক্তি অনুযায়ী অপরিশোধিত জ্বালানি তেল উত্তোলন কমানোর কথা জানিয়েছে তারা।

দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী অ্যালেক্সজান্ডার নোভাক জানান, জ্বালানি তেল উত্তোলনে আমাদের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তা পালন করব।

কয়লা আমদানি কমিয়েছে জার্মানি

কয়লা আমদানি ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ কমিয়েছে জার্মানি। গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনতে এই উদ্যোগ।

গত বছর মোট ৪ কোটি ২ লাখ টন কয়লা আমদানি করে যা আগের বছরের তুলনায় ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ কম। জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

২০১৯ সালে বিদ্যুতের জন্য ২ কোটি ৬৮ লাখ টন কয়লা কেনে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ কম।

গ্রন্থনা: এনার্জি বাংলা ডেস্ক
রয়টার্স থেকে

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ ১৪২৬, ২১শে জানুয়ারি ২০২০

গ্যাস কূপ খনন করা যন্ত্র। ছবি : সংগৃহীত

তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের হালচাল

আবদুল বাকি

দেশে গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুসন্ধানের কোনো কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়নি

দেশে গ্যাসের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; কিন্তু দেশের ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাসের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কারণ গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দ্রুত যে সব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা দৃশ্যমান নয়। বহু আগে থেকে যেসব কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদন হতো সেগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হচ্ছে কিংবা উৎপাদন কমে আসছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে গ্যাসের মজুদ ও চাপ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এটাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা।

এর বিপরীতে গ্যাসের মজুদ বাড়ানো এবং একইসঙ্গে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত কিছু কাজ করতে হয় যেগুলো করা হচ্ছে না। ফলে দেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়ন অনেকাংশে স্থবির হয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যথার্থ হবে যে, গত বছর (২০১৯ সাল) দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো অনুসন্ধান বা উৎপাদন কূপ খনন করা হয়নি।

শুধু আজারবাইজানের কোম্পানি 'সকার' একটি ড্রাই কূপ (সেমুতাং সাউথ-১) খনন করেছে। বলা বাহুল্য, উক্ত ভূ-গঠনে এর আগেও একাধিক কূপ খনন করে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। ২০১৮ সালে যে ১০৮টি কূপ খননের পরিকল্পনা বাপেক্স করেছিল তাও স্থবির হয়ে আছে। বর্তমানে বাপেক্স শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ চালাচ্ছে, যা চলতি বছরে শেষ হবে। যদি উক্ত কূপে গ্যাস পাওয়া যায় তবে উৎপাদন করতে আরও ১-২ বছর লেগে যাবে। আর যদি গ্যাস পাওয়া না যায় তবে চলতি বছরও (২০২০ সালে) দেশে নতুন কোনো গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া যাবে না।

ভোলা অঞ্চলে রাশিয়ার কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে দিয়ে যে তিনটি কূপ খননেরর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে গ্যাস উৎপাদন যেমন বাড়ত, তেমনি দেশে গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধি পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকত। বর্তমানে উক্ত তিনটি কূপ খননের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হলে চলতি বছর কূপগুলো খননের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ ও ২০২০ সালে দেশের উৎস থেকে বাড়তি গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা কম।

রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্সের নামে বরাদ্দকৃত ৮ ও ১১ নম্বর ব্লকে এখন পর্যন্ত সুনেত্র অনুসন্ধান কূপ-১ ছাড়া আর কোনো কূপ খনন করা হয়নি। উক্ত এলাকায় হরিপুর-১ নং কূপে তেল প্রাপ্তির আলামত প্রমাণ করে যে, ওই অঞ্চলে তেল বা গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সে দিক বিবেচেনা করে ওই দুটি ব্লকে একাধিক অনুসন্ধান কূপ খনন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, বিদেশি কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড মহশেখালীতে কাঞ্চন-১ অনুসন্ধান কূপ খননের যে প্রস্তুতি নিয়েছিল তা এখন পর্যন্ত শুরুই করতে পারেনি। ফলে চলতি বছরে সেখান থেকেও কোনো ধরনের গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা অধরাই থাকছে।

দেশে গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে (ব্লক-২২) অনুসন্ধানের কোনো কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়নি। কারণ এলাকাটি পুরোটাই পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত। এখানে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো সমতলভূমির মতো সহজ নয়। পার্বত্য এলাকায় ঝুঁকি বেশি। কারণ সেখানকার ভূগঠন উঁচু এবং খাড়া, ফরমেশনগুলোর অ্যাঙ্গেল বেশি হওয়ায় দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ করে তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন। এ ছাড়া এ ধরনের ভূগঠনে বিভিন্ন ধরনের চ্যুতি বিদ্যমান থাকায় ভূগঠনগুলো জটিল।

এসব এলাকায় তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনায় যেমন ঝুঁকি রয়েছে তেমনি তা ব্যয়বহুলও।

উক্ত এলাকায় বিদেশি কোম্পানি দ্বারা ভূকম্পন জরিপ করিয়ে ২/৩টি স্থানে অনুসন্ধান কূপ খননের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল। ওই সব স্থানে বাপেক্সসহ অন্য কোনো বিদেশি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে যদি পুনঃমূল্যায়ন করে কূপ খনন করা যায় তাহলে ২/৩ বছরের মধ্যে গ্যাস পাওয়ার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এ অঞ্চলে গ্যাস পাওয়া গেলে পুরো চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সহজ হবে। এ ছাড়া, স্থলভাগে সহসাই গ্যাস প্রাপ্তির আপাতত কোনো সম্ভাবনা নাই।

বাপেক্স ও গ্যাজপ্রম যৌথভাবে ভোলা গ্যাসক্ষেত্রসহ আশপাশের এলাকায় যে কারিগরি মূল্যায়নের পরিকল্পিত হাতে নিয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে ওই অঞ্চলে আরও অনুসন্ধান কূপসহ একাধিক মূল্যায়ন কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। কারণ ভোলা জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক জরিপের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, উক্ত এলাকা গ্যাসসমৃদ্ধ অঞ্চল। কাজেই সেখানে অধিক কূপ খনন করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে ভোলায় গ্যাসভিত্তিক আরও বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং অন্যান্য শিল্প স্থাপন করে ওই অঞ্চল এবং সার্বিকভাবে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ সালের মধ্যে ওই গ্যাস দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ও অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব।

দেশের গভীর সমুদ্রসীমায় এখন পর্যন্ত তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের প্রাথমিক কার্যক্রমও শুরু হয়নি। মাল্টিক্লায়েন্ট সাইসমিক জরিপ করার কোনো লক্ষণও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। এ সংক্রান্ত চুক্তি সইসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ চলতি বছরে শেষ হলে বছরের শেষের দিকে কিংবা আগামী বছরের শুরুর দিকে ওই জরিপ শুরু করা হতে পারে। এরপর জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ইন্টারপ্রেটিশন করে কূপ খনন করতে আরও ৩/৪ বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ ২০২৪ সালের আগে সমুদ্র থেকে কোনো গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাও জানা যাচ্ছে না।

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স

"জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র-উত্তর (ষোলশহর অফিস)
হট লাইন: ১৬৫১২, ফোন : ০৩১-৬৫৫৭৯৬
মোবাইল : ০১৭৩০-৭২৮৪৪৪

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্রধান কার্যালয় : ১৩৭/এ সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

"জাতীয় সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন"

জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র-দক্ষিণ (হালিশহর অফিস)
হট লাইন: ১৬৫১২, ফোন : ০৩১-২৫১৬৬২০, ০৩১-২৫২৬৬০৪
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭১৭৬০৮

* অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখবেন না। রান্না শেষে গ্যাসের চুলাটি বন্ধ করুন।
* গ্যাস স্বল্পতাজনিত বা অন্য কোন কারণে চুলাটি আপনা আপনি নিভে গেলেও সতর্কতার সাথে চাবিটি বন্ধ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হোন।
* চুলা জ্বালানোর কমপক্ষে ১৫/২০ মিনিট পূর্বে রান্না ঘরের দরজা জানালা খুলে অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।
* রান্না ঘরের জানালা সবর্দা খোলা রাখুন। জানালা না থাকলে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* রাইজার বা উৎস লাইনে লিকেজের আলামত পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানির জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ
* গ্যাস লিকেজ বা দুর্ঘটনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনার আঙ্গিনায় স্থাপিত গ্যাস রাইজারটিতে অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করুন।
* গ্যাস রাইজারটি কোনভাবেই লোহার গ্রীল কিংবা শীট/বক্স দ্বারা আবদ্ধ করবেন না এবং গ্যাস লাইনের উপর কোনরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করবেন না।
* গ্যাস পাইপ লাইনের সন্নিকটে কোন দাহ্য পদার্থ রাখা বা বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনার সচেতনতাই পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে

কেজিডিসিএল কর্তৃপক্ষ

সমুদ্র ও উপকূল অপার সম্ভাবনাময়

আমজাদ হোসেন

বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রের গ্যাসের মজুদ এখনও অজানাই রয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরে সাংগু গ্যাসক্ষেত্র থেকে কিছু গ্যাস তোলা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের পাহাড়, দ্বীপ, সমুদ্র ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একই সময়ে গ্যাস তৈরি হয়েছে। টেকটনিক মুভমেন্টের কারণে চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল থ্রাস্ট ও চ্যুতির জন্য উপরে উঠেছে এবং হাইড্রোকার্বনযুক্ত ফরমেশনে ফাটল সৃষ্টির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে ভূ-পৃষ্ঠে গ্যাস নির্গত হচ্ছে

বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশ ও এর উপকূলীয় এলাকার প্ল্যাটফর্ম সীমার মধ্যে এ পর্যন্ত সাতটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হলো স্থলভাগের শাহবাজপুর, ভোলা উত্তর, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও ফেনী এবং সমুদ্রবক্ষের কুতুবদিয়া ও সাঙ্গু। এর সবকটি গ্যাসক্ষেত্রই পললভূমিতে (মাইওসেন সেডিমেন্টস)-এ আবিষ্কৃত। এই ক্ষেত্রগুলোতে পাওয়া গ্যাসের উপাদান (কম্পোজিশন), গ্যাসক্ষেত্রের চাপ (রিজার্ভার প্রেসার) ও উত্তাপ প্রায় একই রকম।

বরিশাল (মুলাদি), ভোলা, নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর), হাতিয়া, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম (সাঙ্গু, কুতুবদিয়া)-সহ দেশের দক্ষিণাংশে তেল-গ্যাস জমা হওয়ার নিদর্শন প্রমাণিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান খুব নিরাপদ এবং নিশ্চিত। টেকটনিক মুভমেন্টের কারণে বাংলাদেশের এই অঞ্চলগুলি উঁচু-নিচু হয়ে গেছে যা বেঙ্গল বেসিনের আওতাভুক্ত।

ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের পাহাড়, দ্বীপ, সমুদ্র ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একই সময়ে গ্যাস তৈরি হয়েছে। টেকটনিক মুভমেন্টের কারণে চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল থ্রাস্ট ও চ্যুতির জন্য উপরে উঠেছে এবং হাইড্রোকার্বনযুক্ত ফরমেশনে ফাটল সৃষ্টির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে ভূ-পৃষ্ঠে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এইসব এলাকায় কূপ খননের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পটিয়া, জলদি, সীতাপাহাড় এবং কাসালং এলাকায় সম্ভাব্য গ্যাসের স্তর ৫০০ থেকে ২৫০০ মিটারের মধ্যে। অতএব, এসব এলাকায় অল্প গভীরতার খননযন্ত্র দিয়ে কম খরচে কূপ খনন, ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।

অপরদিকে, বঙ্গোপসাগরের বুক, দ্বীপাঞ্চল ও এর নিকটবর্তী এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বিশাল পুরু (প্রায় ১৯ কিলোমিটার) পাললিক শিলা জমা হয়েছে, যা গ্যাসের আধারকে সুরক্ষিত করেছে। তেল-গ্যাসের উপস্থিতির জন্য এ ধরনের আধারের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। অগভীর সমুদ্র এবং দ্বীপ এলাকার চেয়ে গভীর সমুদ্রের পানির গভীরতা ৪০০-১৪০০ মিটার বেশি হওয়ায় তেল-গ্যাসের আধার নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা বেশি। কেননা গভীর সমুদ্রে টেকটনিক মুভমেন্টের ফলাফল তুলনামূলকভাবে কম। ভূতাত্ত্বিক এবং ভূপদার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস প্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের হাতিয়া ট্রাফ-এর খনন করা সকল কূপেই গ্যাস পরিলক্ষিত হয় যার ৮০ শতাংশ আবিষ্কৃত বাণিজ্যিক গ্যাস, ২০ শতাংশ কূপ খননকালীন গ্যাস পরিলক্ষিত হয়। তবে ভূতাত্ত্বিক জটিলতার কারণে সঠিকভাবে কূপ পরীক্ষণ করা যায়নি।

মিয়ানমারে স্থলভাগে ৫৩টি এবং সমুদ্রবক্ষে ৫১টি, সর্বমোট ১০৪টি ব্লক। মিয়ানমার ও ভারত তাদের সমুদ্রসীমা মাল্টিকায়েন্ট জরিপ করেনি। পাক্ষন্তরে মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে ২০টি ব্লকে ১৩টি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারত্ব চুক্তি (পিএসসি) করে এ-৪, এ-৫, এ-৬, এ-৭, এ-৯, এডি-২, এডি-৩, এডি-৫, এডি-৭, এডি-১১, এম-১১, এম-১২, এম-১৩, এম-১৪ ব্লকে দ্বি-মাত্রিক এবং ত্রি-মাত্রিক ভূকম্পন জরিপ ও কূপ খননের মাধ্যমে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

২০১৬ ও ২০১৭ সালে মিয়ানমার এ-৬ গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খননের মাধ্যমে নতুন গ্যাসের স্তর (৪৮০০ মিটার, যার পানির গভীরতা ২৩০০ মিটার) অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে ২৫০০ মিটার নিচে ২ টিসিএফ গ্যাস আবিষ্কার করেছে যা বাংলাদেশর অগভীর, গভীর সমুদ্র ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও প্রাপ্তিকে আরও সম্ভাবনাময় করেছে।

বাংলাদেশের কুতুবদিয়া কূপে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ২৬০০ মিটার নিচে গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে (১৯ এমএমসিএফডি)। অন্যদিকে সাঙ্গু ক্ষেত্রের গ্যাস স্তরের গভীরতা ৩১০০-৩৪০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং গ্যাস প্রেসার (৪৩০০-৪৮০০ পিএসআই)। সমুদ্র তীরবর্তী ভোলা দ্বীপ এলাকার ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে ৬টি কূপ খনন করে সব কূপেই গ্যাসের স্তর ২৫০০-৩৪০০ মিটারের মধ্যে এবং একই চাপে (৪৮০০-৫৪০০ পিএসআই) পাওয়া গেছে।

১৯৬৯-১৯৭৬ পর্যন্ত মিয়ানমারের এলাকাভুক্ত সমুদ্রবক্ষে জাপানি ঠিকাদার, প্রাকলা জার্মান কোম্পানি এবং মিয়ানমার অয়েল করপোরেশন কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ভূকম্পন জরিপ ও অনুসন্ধান কূপ খনন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ৮টি বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ৩১ হাজার ৬০০ লাইন কিলোমিটার ভূকম্পন জরিপ এবং ৭টি অনুসন্ধান কূপ খনন ও একটি গ্যাসক্ষেত্র (কুতুবদিয়া) আবিষ্কার করে। অথচ তার পর থেকে এখন পর্যন্ত সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ে উল্লেখিত সমপরিমান ভূকম্পন জরিপ করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর আমলে গ্যাসের ব্যবহার ও মূল্য এখনকার মত ছিল না। তাই বিদেশি কোম্পানিগুলো কুতুবদিয়া ছাড়া সবগুলি কূপেই ৪০০০ থেকে ৪৬০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন করেছে মূলত তেল প্রাপ্তির লক্ষ্যে। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনুমিত হয় যে উক্ত খননকৃত গভীর কূপগুলোতে উচ্চ চাপের পানি থাকায় যথাযথভাবে কূপ পরীক্ষণ তখন সম্ভব হয়নি।

এই অবস্থায় সমুদ্রবক্ষে ও স্থলভাগে খননকৃত গভীর কূপগুলোর লগিং এবং ভূকম্পন জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করলে উপরিভাগে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে। অথচ বাংলাদেশে ৬০০০ মিটার গভীরতার কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস প্রাপ্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। এমন কি এই উপমহাদেশেও এই গভীরতায় গ্যাস উৎপাদনের কোনো নজির নেই। আমাদের সীমিত কারিগরি দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনা করে পার্শ্ববর্তী দেশের ভূখণ্ড ও আমাদেরসা দেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ইতিহাস থেকে ভূতাত্ত্বিক জটিলতা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে সফল কূপ খননের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে একই সময়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্যাসের মজুদ সৃষ্টি হয়েছে, যা টেকটনিক কারণে ছোট-বড় গ্যাস কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত। এসব এলাকায় অনুসন্ধান ও কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস আবিষ্কার করা সম্ভব। স্বল্পতম সময়ে সমুদ্র, উপকূল এবং পাহাড়ি এলাকায় সরাসরি জরিপ চালিয়ে এবং পূর্ববর্তী কূপ খননের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক স্থান নির্বাচন করে জরুরি ভিত্তিতে একাধিক কূপ খননের মাধ্যমে আগামী তিন বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্যাস উৎপাদন সম্ভব।

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স

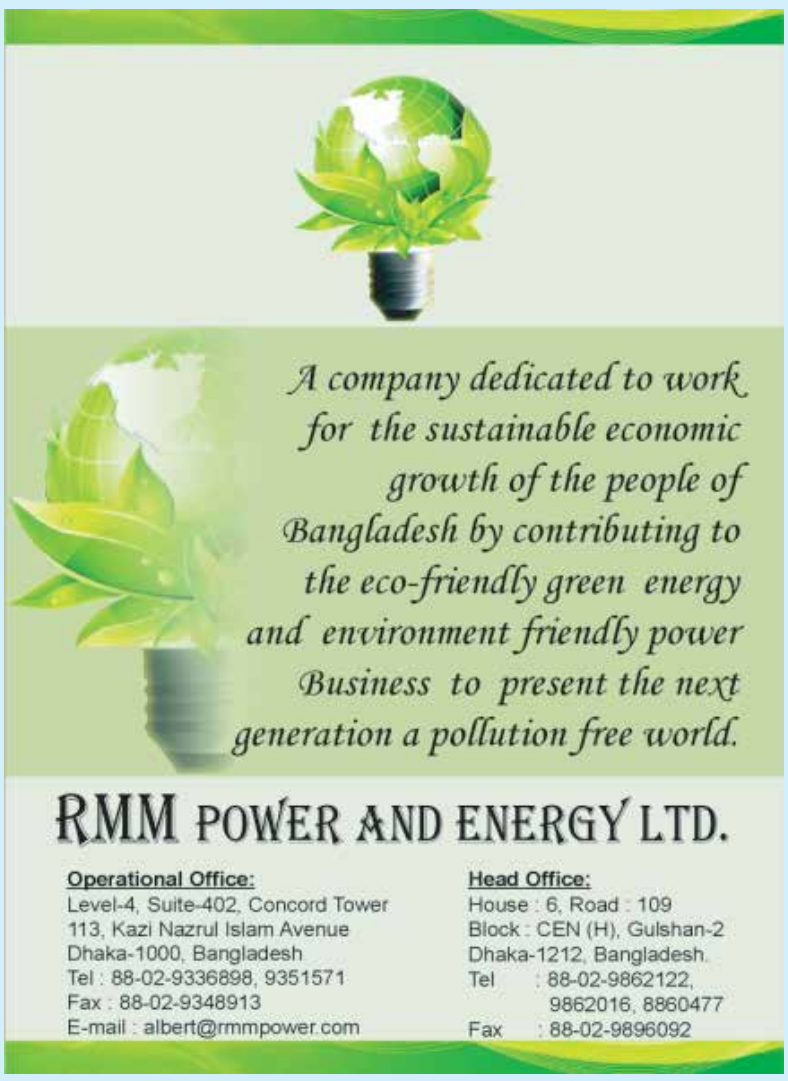

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ ১৪২৬, ২১শে জানুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান : ফিরে দেখা

হাসান ইফতেখার

বর্তমানে বাপেক্সের যে কটি রিগ আছে সেগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করার মতো জনবল নেই। তার অর্ধেকও নেই

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তেল-গ্যাস (হাইড্রোকার্বন) অনুসন্ধান শুরু হয় সেই ব্রিটিশ আমলে, ১৯১০ সালে। ওই বছর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভূ-গঠনে কূপ খননের মাধ্যমে এই অনুসন্ধান শুরু হয়। তারপর গত প্রায় ১১০ বছরে এখানে কূপ খনন করা হয়েছে ১০০টির মতো। এই খননের মাধ্যমে ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র ও একটি তেলক্ষেত্র (সিলেট ৭ নম্বর কূপ, হরিপুর) আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৯৫০-এর দশকে বিদেশি তেল গ্যাস কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি (এসভিওসি), পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) ও পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) অ্যারোম্যাগনেটিক ও গ্রাভিটি জরিপ এবং দ্বি-মাত্রিক ভূকম্পন জরিপের মাধ্যমে সিলেট, কৈলাশটিলা, ছাতক, রশিদপুর, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদে গ্যাস অবকাঠামো চিহ্নিত করে এবং কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

গত শতাব্দীর আশির দশকে প্রাকলা সেইসমস নামক একটি বিদেশি কোম্পানি কয়েকটি স্থানে দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ চালায়। তার ভিত্তিতে পেট্রোবাংলা বিদেশি কোম্পানি নিয়োগ করে জালালাবাদ, সুরমা, বিয়ানীবাজার, মেঘনা ও নরসিংদী ভূ-গঠনে গ্যাস আবিষ্কার করে।

ভোলা জেলার শাহবাজপুরে ১৯৫২ সালে পূর্বোক্ত পিএসওসি দ্বি-মাত্রিক ভূকম্পন জরিপের মাধ্যমে গ্যাসের অবকাঠামো চিহ্নত করে। ১৯৭৪-৭৫ সালে আরকো-প্রাকলা সেইসমস সেখানে পুনরায় দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ চালিয়ে গ্যাসের অবস্থান নিশ্চিত করে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাপেক্স ওই ভূ-কাঠামোয় গ্যাসের অবকাঠামো চিত্রিত করে এবং কূপ খনন করে গ্যাস আবিষ্কার করে।

পরবর্তীকালে প্রেট্রোবাংলা এবং বাপেক্স সীমিত কিছু এলাকায় পুনরায় জরিপ চালায়। তার ভিত্তিতে কূপ খননের স্থান নির্ধারণ করে এবং সেই সব স্থানে কূপ খননের মাধ্যমে সালদা, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এই সব কাজ যখন করা হয় তখন পর্যন্ত বাপেক্সের জনবল যাও বা ছিল, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি বলতে গেলে একেবারেই ছিল না। তা সত্ত্বেও বাপেক্স তখন জনবলের শক্তিতে এই কাজগুলো করতে পেরেছে।

এরপর প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না থাকায় পেট্রোবাংলা তথা বাপেক্স থেকে দক্ষ বেশকিছু পেশাজীবী বিদেশি কোম্পানিতে চলে যায়। তখন থেকে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিতে যে খরা ও স্থবিরতা শুরু হয় তা একটানা চলে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত।

সাধারণভাবে শোনা যায় যে বাপেক্সের দক্ষ জনবল আছে। বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদকালে বাপেক্সের জন্য তিনটি আধুনিক খননযন্ত্র (রিগ) এবং ত্রি-মাত্রিক ভূকম্পন জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। এর আগে বাপেক্সের ছিল মাত্র তিনটি পুরানো রিগ ও দ্বি-মাত্রিক ভূকম্পন জরিপ করার মতো কিছু উপাদান।

বর্তমানে বাপেক্সের যে কটি রিগ আছে সেগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করার মতো জনবল নেই। তার অর্ধেকও নেই। একটি অনুসন্ধান কোম্পানির যে ধরনের জনবল দরকার হয়, যেমন ভূতত্ত্ববিদ, ভূপদার্থবিদ, রসায়নবিদ, খনন প্রকৌশলী প্রভৃতি তার অনেক কিছুই বাপেক্সের নেই। একইসঙ্গে যতই যন্ত্রপাতি আছে বলে আমরা শুনি ততকিছুও নেই।

অবশ্য এর সবকিছুই থাকতে হবে, বিষয়টি তেমনও নয়। এর যে কোনো ধরণের সার্ভিস প্রয়োজন অনুযায়ী কেনা যায়। বাপেক্স ও তা করতে পারে। কিন্তু সে জন্য যে আর্থিক সামর্থ্য দরকার তাও বাপেক্সের নেই। নেই তার কারণ, বাপেক্সকে সেভাবে গড়ে তোলা হয়নি, কিংবা গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে পাঁচ বছর আগেও বাপেক্সে যে একদল তরুণ পেশাজীবীর পদচারণা ছিল এখন তা নেই।

পেট্রোবাংলা ও বাপক্সে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলে ভূ-পৃষ্ঠের নীচে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল এবং একইসঙ্গে অনিশ্চিত। সাধারণ পেশার মানুষের কাছে এসব অবোধ্য ও অদৃশ্যমান। তাই দেশের তেল-গ্যাস পরিস্থিতি কেমন, সম্ভাবনা কোথায় এবং কতটা, নিজেদের সামর্থ্য কতটুকু এসব বিষয়ে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের কাছে দেশবাসী প্রকৃত তথ্য আশা করে।

এদেশের পেট্রোলিয়াম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশক। সেই সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানকার তেল-গ্যাসের সম্ভাবনাময় অবকাঠামোগুলো ওই সময় বিদেশি কোম্পানির আবিষ্কার করা। পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের দক্ষ জনবল সেই অবকাঠামো গুলোকে বাস্তবে গ্যাস উত্তোলনযোগ্য করেছে।

বাপেক্সকে সব সময় কুয়ার ব্যাঙ করে রাখা হয়েছে। বাইরের দুনিয়ায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করার কোনো সুযোগ বাপেক্স পায়নি।

পেট্রোবাংলার জনবলকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য ১৯৮০ সালে বাংলাদশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) স্থাপন করা হলেও তার কার্যকরিতা অত্যন্ত সীমিত। বিগত ৪০ বছর বহু বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নিয়োজিত আছে। তাদের মাধ্যমে বিপিআইকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নিলে একটি কাজের কাজ হতে পারতো।

দেশের জনবল উন্নয়নে বিপিআইকে বিদেশি প্রশিক্ষণ একাডেমির সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে দেশে এমন একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হতে পারতো যারা এখানকার স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রবক্ষে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সামর্থ্য অর্জন করত। বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে এ ধরণের দক্ষ জনবল গড়ে তোলাই পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিত।

লেখক : সাংবাদিক

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র পরিচিতি

হিসাব: টিসিএফ

ক্রম	নাম	আবিষ্কার	অবস্থান	আবিষ্কারক সংস্থা	মোট মজুদ	উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উত্তোলন	অবশিষ্ট মজুদ
১	হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র	১৯৫৫	সিলেট	বার্মা ওয়েল	০.৪৪৪	০.২৬৬	০.১৫৮	০.১০৮
২	ছাতক গ্যাসক্ষেত্র	১৯৫৯	সুনামগঞ্জ	বার্মা ওয়েল	১.৯০০	১.১৪০	০.০২৯	১.১১৩
৩	রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬০	হবিগঞ্জ	পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি	২.২৪২	১.৩০৯	০.০৮০	১.২২৭
৪	কৈলাসটিলা গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬২	সিলেট	পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি	৩.৬৫৭	২.৫২৯	০.১০৮	২.৪২১
৫	তিতাস গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি	৪.১৩২	২.১০০	০.৩৫৩	০.৭৪৭
৬	হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬৩	হবিগঞ্জ	পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি	৩.৬৬৯	১.৮৯৫	০.৫৬৭	১.৩২৮
৭	সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬৯	খাগড়াছড়ি	ওজিডিসি	০.১৬৪	০.০৯৮		০.০৯৮
৮	বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র	১৯৬৯	কুমিল্লা	পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি	১.৪৩২	০.৮৬৭	০.৫০১	০.৩৬৬
৯	কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র	১৯৭৭	কক্সবাজার	ইউনিয়ন ওয়েল	০.৭৮০	০.৪৬৮		০.৪৬৮
১০	বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র	১৯৭৭	নোয়াখালী	পেট্রোবাংলা	০.০২৫	০.০১৪		০.০১৪
১১	বিয়ানীবাজার গ্যাসক্ষেত্র	১৯৮১	সিলেট	পেট্রোবাংলা	০.২৪৩	০.১১৩		০.১১৩
১২	ফেনী গ্যাসক্ষেত্র	১৯৮১	ফেনী	পেট্রোবাংলা	০.১৩২	০.০৮০	০.০৩৬	০.০৪৪
১৩	কামতা গ্যাসক্ষেত্র	১৯৮১	গাজীপুর	পেট্রোবাংলা	০.৩২৫	০.১৯৫	০.০২১	০.১৭৪
১৪	জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র	১৯৮৯	সিলেট	সিমিটার	১.৫০০	০.৯০০		০.৯০০
১৫	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র	১৯৮৯	সিলেট	পেট্রোবাংলা	০.৩৫০	০.২১০		০.২১০
১৬	মেঘনা গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯০	নরসিংদী	পেট্রোবাংলা	০.১৯৪	০.১২৬	০.০০৪	০.০৮০
১৭	নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯০	নরসিংদী	পেট্রোবাংলা	১৫৯	১১১	২৯.০৩	৮১.৯৭
১৮	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯৫	ভোলা	বাপেক্স	০.৫০৪	০.৩৩৩		০.৩৩৩
১৯	সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯৬	চট্টগ্রাম	কেয়ার্ন এনার্জি	১.০৩১	০.৮৪৮		
২০	সালদা গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাপেক্স	০.২০০	০.১৪০		০.১৪০
২১	মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯৭	মৌলভীবাজার	ইউনিকল	০.১৪৭	০.১১০		০.১১০
২২	বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র	১৯৯৮	হবিগঞ্জ	ইউনিকল	২.৪	১.৭৭	১.৭৭	
২৩	লালমাই গ্যাসক্ষেত্র	২০০৫	কুমিল্লা	ট্যাল্লো				
২৪	ভাঙ্গুরা গ্যাসক্ষেত্র	২০০৫	কুমিল্লা	বাপেক্স	৪৫৭			
২৫	সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র	২০১১	নোয়াখালী	বাপেক্স				
২৬	সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্র	২০১১	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা	বাপেক্স				
২৭	শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র	২০১২	কুমিল্লা	বাপেক্স				
২৮	পাবনা গ্যাসক্ষেত্র	২০১৭	মোবারকপুর,সাঁথিয়া,পাবনা	বাপেক্স				
২৯	ভোলা উত্তর-১	২০১৭	শাহবাজপুর,ভোলা	বাপেক্স	১.৫ ট্রিলিয়ন			

সূত্র : পেট্রোবাংলা

উত্তরাঞ্চলে লোকসান কমাতে স্মার্ট মিটার

১৫ই জানুয়ারি

আগামী বছরের মধ্যে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক লাখ ৩১ হাজার গ্রাহককে স্মার্ট মিটার দেওয়া হবে। এ জন্য ওই এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহকারি কোম্পানি নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) চীনা কোম্পানি সেনজেন স্টার ইন্সট্রুমেন্ট এবং অকুলিন টেকের সঙ্গে চুক্তি করেছে।

মিটার বিতরণে খরচ ধরা হয়েছে ৪১৪ কোটি ৮২ লাখ ৬২ হাজার টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ৪০০ কোটি ৬৯ লাখ ৮৩ হাজার টাকা, নেসকো দেবে ১৪ কোটি ১২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। প্রথম পর্বের খরচ ধরা হয়েছে ১০৭ কোটি ৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

চলতি বছর অক্টোবর মাসের মধ্যে এই মিটার বিতরণ শেষ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। স্মাট মিটার লাগানোর পর কারিগরি ছাড়া লোকসান শূন্যের কোঠায় আসবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

এখানে এক লাখ ৩১ হাজার ৩৫৩টি একক মিটার, আট হাজার ৯৫টি তিনফেজ মিটার এবং ৮৩৯টি ডিসিইউ স্থাপন করা হবে।

রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে নেসকোর পক্ষে কোম্পানি সচিব সৈয়দ আবু তাহের এবং চীনা কোম্পানি সেনজেন স্টারের প্রেসিডেন্ট লাউ চুন ডেন এবং অকুলিন টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদাব সাজ্জাদ নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম বলেন, গ্রাহক সন্তুষ্ট না থাকলে সরকারের সব উদ্যোগ ভেস্তে যাবে। এ জন্য গ্রাহকসেবার মান বাড়াতে হবে। সেবার মান বাড়াতে পারলেই সকল কার্যক্রম স্বার্থক হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাস্তবতায় স্মার্ট প্রিপেইড মিটার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে। এটা প্রকৌশলীদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে যাতে বড় পরিসরে বা বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সেবা দিতে এই মিটারগুলো সমস্যার না করে সেদিকেও নিয়মিত খেয়াল রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি) এর চেয়ারম্যান সুবীর কিশোর চৌধুরী, নেসকোর চেয়ারম্যান হুমায়ন কবীর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সাঈদ আহমেদ, নিসকো ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান আবদুল ফাত্তাহ

এবিএম আবদুল ফাত্তাহ্

নিজস্ব প্রতিবেদক

এবিএম আবদুল ফাত্তাহ্ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) চেয়ারম্যান পদে যোগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাকে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান পদে প্রেষণে নিয়োগ দেয়। ১৯৮৯ সালে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সিএনজি ওনার্স এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

মাসুদ খান

ফারহান নূর

বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশনের ২০১৯-২০২১ মেয়াদে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। ১২ সদ্যসের নতুন কমিটিতে সভাপতি মাসুদ খান ও মহাসচিব ফারহান নূর।

ছাদে সৌর স্থাপনে ইডকলের বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বগুড়ায় বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপনে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)। এনিয়ে ইডকল ও ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের মধ্যে অর্থায়ন চুক্তি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ঠরা জানিয়েছেন, এখানের বিদ্যুৎ শুধু বিল কমাবেই না বরং লোডশেডিংয়ের সময় ডিজেলের ব্যবহারও কমাবে। এছাড়াও প্রকল্পের মালিকরা নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০১৮ এর আলোকে প্রকল্প থেকে উৎপাদিত অব্যবহৃত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দিতে পারবে। এখানে ৪৮৪ দশমিক ৪৪ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌর প্যানেল স্থাপন করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ইউনিট প্রতি আট টাকার কম হবে। মোট খরচ হবে তিন কোটি ৩৯ লাখ টাকা। চুক্তির আওতায় ইডকল সহজ শর্তে দুই কোটি ৭১ লাখ টাকা ঋণ দেবে।

ইডকল ছাদভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা দেয়ার পরিকল্পনা করেছে।

চুক্তিতে ইডকলের ডেপুটি সিইও এসএম মনিরুল ইসলাম ও ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের নির্বাহি পরিচালক প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম সই করেন।

জি-গ্যাস সরবরাহ করছে সুপেয় পানি

বাংলাদেশের দক্ষিণে সুপেয় পানি সমস্যা প্রকট। লবণাক্ত সাথে আর্সেনিক। এই দুই মিলে সুপেয় পানি দুর্লভ। এ কারণে এই অঞ্চলের মানুষ বাস করছে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। পানির কারণে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যেই জীবনযাপন করছে। অথচ এ ঝুঁকির কথা এলাকার অধিকাংশ মানুষ জানেই না। ফলে শিশুসহ অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন পানিবাহিত রোগে।

জি-গ্যাস সম্প্রতি খুলনার দাকোপ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ কেন্দ্র খুলেছে। 'পান করলে নিরাপদ পানি, ভালো থাকবে আগামী' এই স্লোগানে স্থাপন করেছে নিরাপদ মিষ্টি পানি সরবরাহ কেন্দ্র। এ ছাড়াও লবণাক্ত পানির স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়ে সচেতন করছে এলাকাবাসীকেও।

জি-গ্যাস তাদের এই ভালো রাখার আয়োজন অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে।

জি-গ্যাস সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শরীর সুস্থ থাকা প্রয়োজন। আর সুস্থ শরীরের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি, যা দক্ষিণের এই এলাকায় ঘাটতি আছে। আমরা চেষ্টা করছি ঝুঁকিমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ করার।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ ১৪২৬, ২১শে জানুয়ারি ২০২০

১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পটুয়াখালীর পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট চালু হয়েছে। উপর থেকে তোলা পুরো বিদ্যুৎকেন্দ্র। ছবি : এনার্জি বাংলা

পায়রা : দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

পটুয়াখালির পায়রার বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে পুরো ক্ষমতায় আনুষ্ঠানিক উৎপাদন শুরু হবে।

এটা দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র। শুধু তাই নয় আমদানি করা কয়লাভিত্তিক প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্রও। এখানে দুই ইউনিটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। আপাতত প্রথম ইউনিট থেকে আংশিক উৎপাদন হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে পুরোটা হবে। প্রতিদিন অল্প অল্প করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬০ মেগাওয়াট। এর আগে দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রের এক ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৫০ মেগাওয়াট। সেটা ছিল গ্যাসচালিত।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট এ বছরের মধ্যেই চালু হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ মালিকানায় গঠন করা বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (বিসিপিসিএল) এই কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এর অর্ধেক মালিক বাংলাদেশ আর বাকী অর্ধেক চীন। বিনিয়োগসহ সকল অংশীদারিত্ব দুই দেশের সমান। এতে খরচ হয়েছে ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার।

বিসিপিসিএল এর প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা খোরশেদুল আলম এনার্জি বাংলাকে বলেন, এখানে সর্বাধুনিক আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় সব ধরনের সতর্কতা মেনে চলা হচ্ছে। কয়লার যে মজুদাগার করা হয়েছে তা পুরোপুরি ঢাকনা দেয়া। জাহাজ থেকে কয়লা নামানোর সময়েও ঢাকনা থাকবে। কোথাও কয়লা দেখা যাবে না। পরিবেশের দিকে সর্বোচ্চ নজর দেয়া হয়েছে। ২২০ মিটার উচ্চতার চিমনি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্গত গ্যাস ধরতে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ৯৬ শতাংশ গ্যাস ধরা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ ছাই ধরা হবে। কোন ছাই উড়বে না।

সেচ : বিদ্যুতে সর্বোচ্চ গ্যাস তেল কয়লা সরবরাহ হবে

- সকল আবেদনকারী পাবে বিদ্যুৎ
- চাহিদা হবে ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষি সেচ মৌসুম আসন্ন। আগের মতো সংকট নেই। তবু তেলের ওপর অনেকটা নির্ভরতা রেখেই এ সেচ মোকাবেলা করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এসময় তেলচালিত সব বিদ্যুৎকেন্দ্র চলবে। সাথে থাকবে গ্যাসের নিয়মিত যোগান। এ জন্য এবারও সার কারখানা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর থাকবে সচেতন থাকার তাগিদ।

শহর আর গ্রামকে লোডশেডিংমুক্ত রেখেই কৃষি সেচ মোকাবেলায় গত সপ্তাহে বৈঠক করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক। আর সেই বৈঠকে সচেতনতার পাশাপাশি জানানো হয় নানা পরিকল্পনার কথা।

বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান মাহমুদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

সেচের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে যতগুলো আবেদন আছে সকলকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি থেকে সেচ মৌসুম শুরু হয়। চলে মে মাস পর্যন্ত। ফসল ফলানোর সময় এই চার মাস।

বৈঠকে জানানো হয়, এবার সেচ মৌসুমে ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা হবে, যা গত বছর ছিল ১২ হাজার ৮৯৩ মেগাওয়াট। এবার প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট চাহিদা বেড়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফার্নেস অয়েলের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার টন। আর ডিজেল ৫ হাজার ৬০০ টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে কেন্দ্রগুলোতে গ্যাস, ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সেচ পাম্পগুলোকে রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের এই সময় সেচযন্ত্র চালানোর অনুরোধ করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

যেসব গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এখন নিয়মিত উৎপাদনে আছে সেগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। যেসব উপকেন্দ্র সঞ্চালন লাইন ও গ্রিড উপকেন্দ্র সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ বাকি আছে, তা এই জানুয়ারির মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সাথে ওভারলোডেড উপকেন্দ্রও দ্রুত মেরামত করতে বলা হয়েছে।

তেল চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে দুই মাসের পরিমাণ জ্বালানি তেল মজুদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সর্বোচ্চ চাহিদার সময় অর্থাৎ বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত পানির পাম্প, ওভেন, হিটার, ওয়েলডিং মেশিন ইত্যাদি বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়েছে।

সেচে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য 'ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই' পদ্ধতি প্রচার করতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পাওয়ার সেলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেচ মৌসুমে জ্বালানি তেল পরিবহন এবং বিদ্যুৎ স্থাপনার নিরাপত্তা দিতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম তদারকি করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক : **অরুণ কর্মকার** সম্পাদক ও প্রকাশক : **রফিকুল বাসার** এনার্জি বাংলা অনলাইন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **সাগর সরওয়ার**
এনার্জি বাংলা, শতাব্দী সেন্টার, ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, স্যুট # ১০-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং **মাহির প্রিন্টার্স** ফকিরেরপুল থেকে ছাপানো
সম্পাদকীয় কার্যালয় : ২/৩-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৫৯২৩২, +৮৮ ০১৫৫২ ৩১৫৭৪৫
ই-মেইল : energybanglabd@gmail.com, www.energybangla.com, www.energybangla.com.bd